বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩২ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২১

লিবিয়ায় রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে ফেরত বাংলাদেশী অভিবাসীদের উপর একটি সমীক্ষা

মোহাম্মদ রাশেদ আলম ভূঁইয়া*

১। ভূমিকা

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অভিবাসী প্রেরণকারী এবং রেমিট্যান্স আরোহনকারী দেশ। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন কারণে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের শ্রমবাজার সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহ ওঠানামা করছে, অনেক ক্ষেত্রে কমেও যাচ্ছে। জনশক্তি রপ্তানিতে নেতিবাচক চিত্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবকের মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিই বাংলাদেশের শ্রমবাজারের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও পরিস্থিতিগত কারণে বাধ্য হয়ে বহু শ্রমিক অপ্রত্যাশিতভাবে দেশে ফেরত আসছেন। জরুরি পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক অভিবাসীদের স্বদেশ প্রত্যাবসন সংক্রান্ত সাম্প্রতিক সংকট বর্তমানে বিশ্বব্যাপী অভিবাসন বিশেষজ্ঞদের কাছে উদ্বেগের নতুন কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। মূলত অভিবাসীদের গন্তব্য দেশগুলোতে রাজনৈতিক পরিবর্তন ও অনাকাঙ্ক্ষিত সংঘাতের ফলে আন্তর্জাতিক অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। যখন রাজনৈতিক আন্দোলন ও জন অসন্তোষ গৃহযুদ্ধে রূপ নেয় এবং তা থেকে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে তখন অভিবাসীদের জীবন, জীবিকা, উপার্জন ও সম্পদ ব্যাপকভাবে নিরাপত্তাহীনতার হুমকিতে পড়ে। এ অবস্থায় পর্যাপ্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার অভাবে অভিবাসী প্রেরণকারী দেশগুলো সংঘাতপূর্ণ স্থানে তাদের অভিবাসিত নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে নানা রকম বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হয়। সংঘাতময় পরিস্থিতিতে দ্রুততার সাথে অভিবাসীদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া, প্রাথমিকভাবে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য পাশ্ববর্তী দেশে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা ও যত দ্রুত সম্ভব দেশে ফেরত আনা, তাদের ক্ষতিপূরণ কিংবা পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা ইত্যাদি কাজ অভিবাসী প্রেরণকারী দেশগুলোকে তাদের নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগীতায় খুব দ্রুত সময়ে সম্পন্ন করতে হয়। ২০১১ সালে লিবিয়ায় গাদ্দাফী সরকারকে উৎখাতের আন্দোলন পরবর্তী সময়ে সংঘাতময় পরিস্থিতিতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য জনশক্তি প্রেরণকারী দেশসমূহকে এই ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বর্তমানে ইরাকে চলমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে অভিবাসী শ্রমিকদের জরুরি ভিত্তিতে স্বদেশ প্রত্যাবাসনের বিষয়টি পুনরায় আলোচনায় উঠে আসে।

এ প্রবন্ধে মধ্যপ্রাচ্যে জনশক্তি প্রেরণের বর্তমান পরিস্থিতি, লিবিয়ার শ্রমবাজার, লিবিয়া ফেরত বাংলাদেশী অভিবাসীদের লিবিয়া অবস্থানকালীন সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান, অভিবাসন অভিজ্ঞতা,

* প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাবেক গবেষণা সহযোগী, রিফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরী মুভমেন্টস্ রিসার্চ ইউনিট (রামরু)। উল্লেখ্য যে, এই গবেষণা কর্মটি রামরুর চেয়ারপারসন ড. তাসনিম সিদ্দিকীর নেতৃত্বে এবং সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত রিসার্চ প্রোগ্রাম কনসোর্টিয়াম (আরপিসি)'র অর্থায়নে সম্পাদিত হয়।

পরবর্তীতে সংঘাতের ফলে জরুরি ভিত্তিতে দেশে ফেরত আসার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষতির একটি সমীক্ষা, দেশে ফেরত অভিবাসীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় অবতারণা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে লিবিয়া অবস্থানকালীন অভিবাসীদের সংঘাত-উদ্ভূত ভোগান্তি এবং সেসব ভোগান্তি থেকে মুক্তি পেতে অভিবাসীদের পাশ্ববর্তী দেশে গমন ও নিজ দেশে ফেরা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা উন্মোচন করতে চেষ্টা করা হয়েছে।

২। মধ্যপ্রাচ্যে বাজার পরিস্থিতি এবং লিবিয়ার রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার পটভূমি

বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক শ্রম-অভিবাসনের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। সুদূর অতীত থেকে চলে আসা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ১৯৪০-এর দশকে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক জাহাজে কাজ করার সুযোগ বাংলাদেশীদের জন্য অভিবাসনের নতুন দুয়ার খুলে দেয়। পরবর্তীতে অভিবাসনের গন্তব্যের পথ বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয় এবং উন্নত জীবন জীবিকার প্রত্যাশায় বাংলাদেশ থেকে অভিবাসনের বহমান স্রোত সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কূটনৈতিক সম্পর্কের প্রসার এবং মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার শ্রমবাজারের উন্মোচন অভিবাসনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানির সিংহভাগই মধ্যেপ্রাচ্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সময়ের পরিক্রমাই এই বাজারটি বর্তমানে বাংলাদেশীদের জন্য হাতছাড়া হতেই চলেছে। ইতোপূর্বে মধ্যপ্রাচ্যের যেসব দেশে বাংলাদেশের শ্রমবাজার শীর্ষ পর্যায়ে ছিল, নানা কারণে সেসব দেশেও এখন বাংলাদেশীরা ভালো অবস্থায় নেই। তার উপর রাজনৈতিক অস্থিরতা ও পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে বহু শ্রমিক নিরূপায় হয়ে দেশে ফেরত আসছেন। ফলে এসকল দেশে জনশক্তি রপ্তানির সুযোগ ও সম্ভাবনা দুটোই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কয়েক বছর আগেও সৌদি আরবের শ্রমবাজারের ৩০ শতাংশ বাংলাদেশি শ্রমিকদের দখলে ছিল। আর সৌদি আরবে নিয়োজিত বিদেশিদের মধ্যে চার দশক ধরে প্রথম স্থানে ছিল বাংলাদেশিরা। বেসরকারি হিসাবে সৌদি আরবে অবস্থানরত বাংলাদেশির সংখ্যা প্রায় ৩০ লাখ। দেশটিতে প্রতি বছর গড়ে প্রায় দেড় লাখ শ্রমিক গেলেও ২০০৯ সাল থেকে বছরে মাত্র ১০ থেকে ১২ হাজার বাংলাদেশি শ্রমিক যেতে পারছে। তাছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২০১২ সালে বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানি হয়েছিল ২ লাখ ১৫ হাজার ৪৫২ জন। আর এক বছরের ব্যবধানে ২০১৩ সালে এ সংখ্যা নেমে দাঁড়ায় মাত্র ১৪ হাজার ২৪১ জনে। কুয়েতেও একসময় প্রতি বছর ২৫ থেকে ৩০ হাজার শ্রমিক যেতো। কিন্তু ২০১৪ সালের মে মাস পর্যন্ত মাত্র ২ জন বাংলাদেশি সেদেশে গেছেন। যদিও কুয়েত পুনর্গঠনে সেখানে বর্তমানে প্রচুর নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে। তারপরও সেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি শ্রমিক রপ্তানি কঠিন হয়ে পড়েছে।[১]

২০১১ সালে উত্তর আফ্রিকার দেশ লিবিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে বাংলাদেশসহ বিশ্বের একাধিক রাষ্ট্রকে নানামুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ১৯৭০-এর দশকের শেষ থেকেই বাংলাদেশী কর্মীরা কাজের উদ্দেশ্যে লিবিয়া পাড়ি জমাতে শুরু করে। বিশেষ করে ২০০৬ সালে লিবিয়ার উপর আরোপকৃত জাতিসংঘ এবং যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর থেকেই বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী নাগরিক লিবিয়াতে কাজের উদ্দেশ্য পাড়ি জমান। ফেব্রুয়ারি ২০১১ 'তে লিবিয়াতে যখন কর্নেল গাদ্দাফীর দীর্ঘ শাসনামলের বিপক্ষে আন্দোলন শুরু হয় এবং সেটি পরবর্তীতে

[১] শ্রমবাজার ছোট হয়ে আসায় জনশক্তি রপ্তানিতে ধস,' দৈনিক জনতা, ঢাকা, ২৩ জুন ২০১৪।

পুরোপুরি সহিংসতায় রূপ নেয় তখন অন্যান্য দেশের অভিবাসীদের সাথে সাথে বাংলাদেশী অভিবাসীরাও সব ধরনের দুর্ভোগ ও ভোগান্তির মুখোমুখি হন এবং সর্বোপরি তারা সেখানে শরণার্থীতে পরিণত হয়। জরুরি পরিস্থিতিতে লিবিয়া ও তিউনিসিয়া থেকে সেসময় প্রায় ৩৭,০০০ (সরকারি রেকর্ডে ৩৬,৬৮৩ জন)[২] অভিবাসী শ্রমিক দেশে ফেরত আসে যার মধ্যে ৩০,০০০ বেশি সংখ্যককে সরকারি উদ্যোগে বাংলাদেশ (আইওএম ও ইউএনএইচসিআর এর ব্যবস্থাপনায়) দেশে ফেরত এনেছিল, যা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভিবাসন সংকট মোকাবেলার ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৩। লিবিয়ার শ্রমবাজার এবং বাংলাদেশ থেকে লিবিয়ায় কর্মী প্রেরণ

আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসনের শুরু থেকেই লিবিয়া বাংলাদেশীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য আকর্ষণীয় গন্তব্যস্থল হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। প্রথমদিকে সত্তরের দশকে বাংলাদেশ থেকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমানোদের শতকরা পাঁচ ভাগ লিবিয়াতে যেতেন। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮০ সালে এ সংখ্যা বেড়ে ১০ ভাগে উন্নীত হয়। ১৯৮৬ সালের জানুয়ারিতে ইউরোপে সন্ত্রাসী হামলায় লিবিয়ার যুক্ত থাকার অভিযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লিবিয়ার উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। লিবিয়া থেকে তেল আমদানি, আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য, বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন এবং ভ্রমণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয়।

আরোপিত এই অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ১৯৮৭ সাল থেকে বাংলাদেশ থেকে লিবিয়ায় জনশক্তি রপ্তানিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ থেকে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় লিবিয়াতে জনশক্তি রপ্তানি কমে যায় এবং ১৯৮৯ সালে মোট বৈদেশিক শ্রমশক্তি প্রেরণের হার শতকরা ১.৫ ভাগে দাঁড়ায়। নব্বইয়ের দশকে এই হার টানা ১ ভাগের নিচে চলে আসে। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে স্কটল্যান্ডের লকারবিতে বোমা হামলায় লিবিয়ার নাগরিকদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে ১৯৯২/১৯৯৩ সালে জাতিসংঘ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন লিবিয়ার উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ২০০৩ সালে লকারবি বোমা হামলায় নিহতদের ক্ষতিপূরণ বাবদ লিবিয়া ২.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দিতে সম্মত হলে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়। নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় ধীরে ধীরে লিবিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকে। ২০০৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রও নিষেধাজ্ঞা কিছুটা শিথিল করে এবং ২০০৬ সালে অর্থনেতিক নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরি তুলে নেয়। বেশ কয়েক বছর ধরে কার্যকর এসব নিষেধাজ্ঞার ফলে ২০০১-২০০৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ১ ভাগ বা তারও কম অভিবাসী লিবিয়ায় পাড়ি জমান। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে লিবিয়া সরকার ১৩০ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে পাঁচ বছর মেয়াদি অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনা ঘোষণা করে। ২০০৮ সালে শুরু হওয়া পাঁচ বছরব্যাপী উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় লিবিয়ার সবকার ৩ লাখ বাড়ি, ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয় কমপ্লেক্স, ১০ হাজার কিলোমিটারের অধিক রাস্তা নির্মাণ এবং ২৪ হাজার কিলোমিটার রাস্তার ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ফলে লিবিয়ায় বিপুল পরিমাণে বিদেশী শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা

[২]Summary Report of 'Consultation on the Reintegration and Remigration of Bangladeshi Returnees from Libya' organized by the International Organization for Migration (IOM) Dhaka, 23 November, 2011.

দেখা দেয়। এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে ২০০৮-এর অক্টোবর মাসে লিবিয়া সরকার বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত এক দ্বিপাক্ষিক সমঝোতাপত্র (মেমোর‍্যান্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং) স্বাক্ষর করে।[৩]

অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ সম্পাদনের জন্য দেশী ও বিদেশী কনস্ট্রাকশন ফার্ম লিবিয়াতে শ্রমিক সংগ্রহ শুরু করে। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশী শ্রমিকদের ব্যাপকভাবে লিবিয়া যাওয়ার সুযোগ হয়। ২০০৮ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪০,০০০ বাংলাদেশী কাজের উদ্দেশ্য লিবিয়া যায়। এতে করে ২০১০ সাল নাগাদ জিসিসি আওতাভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর পাশাপাশি লিবিয়াও বাংলাদেশী অভিবাসীদের জন্য একটি বৃহৎ অভিবাসী নিয়োগকারী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তবে এই ধারাবাহিকতা টিকে থাকেনি। বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সীর এবং দালালদের ভিসা জালিয়াতির কারণে অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই লিবিয়া সরকার ২০১০ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ থেকে লোক নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। যার ফলে লিবিয়ায় জনশক্তি রপ্তানি হ্রাস পায়। সর্বোপরি প্রত্যাশা অনুয়ায়ী লিবিয়া শ্রমবাজারের কিয়দাংশই বাংলাদেশ পূরণ করতে সমর্থ হয়।

৩.১। লিবিয়ার শ্রমবাজারে বাংলাদেশী শ্রমিকদের দক্ষতার ধরন

লিবিয়ায় শ্রমবাজার উন্মুক্তের প্রথম দিকে বিশেষ করে দক্ষ জনশক্তি, যেমন- ডাক্তার, নার্স, প্রকৌশলী ও স্থপতিরা, সেখানে গিয়েছিল। পরবর্তীতে ২০০৮ সালের পরবর্তী সময়ে জনশক্তি রপ্তানির অধিকাংশই ছিল অদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ নির্মাণ শ্রমিক। ২০১১ সালে লিবিয়ায় রাজনৈতিক সঙ্কট থাকাকালীন অভিবাসী প্রেরণ বিঘ্নিত হয়। যাহোক গাদ্দাফি সরকারের পতনের পর ২০১২ সালে কোনো নতুন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ছাড়াই আবার লিবিয়ায় অভিবাসন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ২০১২ সালে সর্বমোট ১৪,৯৭৫ জন বাংলাদেশী নাগরিক লিবিয়ায় অভিবাসী হিসেবে পাড়ি দিয়েছেন।

৩.২। লিবিয়া থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ

২০১০ সালের তথ্য অনুয়ায়ী বাংলাদেশ লিবিয়ার শ্রমবাজার থেকে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জন করে যা ঐ বছরের প্রেরিত মোট রেমিট্যান্সের মাত্র দশমিক শূণ্য দুই (০.০২%) ভাগ।[৪] সাধারণত অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়মিতভাবে রেমিট্যান্স প্রেরণে ১ থেকে ২ বছর সময় লাগে। সে হিসেবে যারা ২০০৮/০৯ অর্থবছরে লিবিয়ায় গেছেন তারা স্বাভাবিকভাবে ২০১১ সাল থেকে প্রত্যাশা অনুযায়ী রেমিট্যান্স প্রেরণ করার কথা। এর বাইরে সরাসরি ব্যাংকিং চ্যানেল ছাড়া অন্য চ্যানেলে রেমিট্যন্সে আসার সম্ভাবনাও রয়েছে। তাই রেমিট্যান্সের আকার দিয়ে লিবিয়ার শ্রমবাজারের প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করা কিছুটা অসম্ভব। তবে এক্ষেত্রে আমাদের গবেষণায় প্রাপ্ত অভিবাসীদের মাসিক আয়কে বিশ্লেষণ করলে প্রকৃত চিত্র উপলব্ধি করা যাবে।

৩.৩। লিবিয়ায় রাজনৈতিক সঙ্কট ও অভিবাসীদের প্রত্যাবাসন

ব্যুরো অব ম্যানপাওয়ার, এমপ্লয়ম্যান্ট অ্যান্ড ট্রেনিং (বিএমইটি)'র তথ্য অনুয়ায়ী ১৯৭৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৯০ হাজার বাংলাদেশী কাজের জন্য লিবিয়ায় গিয়েছেন। এদের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক

---

[৩] 'দি ডেইলী স্টার, নভেম্বর ১, ২০০৮।

[৪] বাংলাদেশ ব্যাংক ও ব্যুরো অব ম্যানপাওয়ার, এমপ্লয়ম্যান্ট এন্ড ট্রেনিং (বি.এম.ই.টি)'র "Country-wise overseas Employment and Remittances1976-2012" সারণি থেকে রিফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরী মুভমেন্টস্ রিসার্চ ইউনিট (রামরু) কর্তৃক হিসাবকৃত।

গেছেন ২০০৭-এর পরবর্তী সময়ে। কিন্তু লিবিয়ায় ২০১১ সালে রাজনৈতিক সঙ্কট শুরু হলে এসব অভিবাসীদের অধিকাংশকেই অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে আসতে হয়। প্রসঙ্গত লিবিয়াতে গাদ্দাফী সরকারকে উৎখাতের আন্দোলন শুরু হয় ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময় আন্দোলন সংঘাতের রূপ নেয়। এতে করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভিবাসী শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়। মার্চ মাসে বিভিন্ন দেশের সরকার তাদের জনগণের প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় এবং বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে বাংলাদেশী কর্মীদেরও সেসময় দেশে ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সর্বমোট ৩৬,৬৮৩ জন বাংলাদেশী দেশে ফিরে আসেন। ফিরে আসা অভিবাসীদের মধ্যে বিএমইটির তথ্য সূত্রে মাত্র ১৫৭ জন নারী শ্রমিক রয়েছেন।

৩.৪। ফিরে আসা অভিবাসীদের ডাটাবেজ এবং গবেষণা পদ্ধতি

লিবিয়া ফেরত অভিবাসী শ্রমিকদের তথ্য নথিভুক্ত করার জন্য বিএমইটির পক্ষ থেকে বিমান বন্দরে বিশেষ ডেস্ক খোলা হয় এবং সেখানে অভিবাসীরা তাদের নাম, ঠিকানা ও যোগাযোগের নম্বর এন্ট্রি করে। উল্লেখ্য, অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার আদায় এবং অভিবাসন ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রামরু এক যুগেরও অধিক সময় ধরে গবেষণা ও পরামর্শ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। রামরু (RAMRU) লিবিয়া ফেরত অভিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান, লিবিয়ায় কাজের পরিবেশ, সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে এবং ফিরে আসা অভিবাসীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তাদের কর্মদক্ষতা চিহ্নিত করার জন্য প্রায় ৯,৬২৬ অভিবাসী শ্রমিকের উপর একটি মৌলিক গবেষণা জরিপ চালায় এবং ডাটাবেজ তৈরি করে।

৪। গবেষণার মূল ফলাফলসমূহ

লিবিয়া ফেরত ৯,৬২৬ জন অভিবাসীর উপর রামরু কর্তৃক পরিচালিত গবেষণায় যে তথ্য বের হয়ে এসেছে তাতে দেখা যায় লিবিয়া ফেরত অভিবাসীদের দুই-তৃতীয়াংশের বয়স ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। সাধারণত বাংলাদেশ থেকে অভিবাসনের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়া শ্রমিকদের বেশিরভাগই এই বয়সসীমার। এছাড়া ২৫ শতাংশ লিবিয়া ফেরত অভিবাসীর বয়স ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। সবমিলে অভিবাসীদের গড় বয়স ২৮.৮ বছরের মতো। সুতরাং অধিকাংশ ফিরে আসা অভিবাসীই তাদের কর্মজীবনের উৎকৃষ্ট সময়ে অবস্থান করছেন।

৪.১। প্রত্যাবাসিত শ্রমিকদের পরিবারের গঠন

ফিরে আসা অভিবাসীদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা গড়ে ৬.৬ জন। প্রায় ৬২ শতাংশের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬ থেকে ১০ জনের মধ্যে এবং ৩৬ শতাংশের পরিবারের সদস্য ৩ থেকে ৫ জনের মধ্যে। বাকি ১ শতাংশের বা তারও কম অভিবাসী পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১ থেকে ২ জন। লক্ষণীয় যে, অধিকাংশ প্রত্যাবাসিত অভিবাসীই তাদের পরিবারের মূল উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।

৪.২। শিক্ষাগত যোগ্যতার চিত্র

লিবিয়া ফেরত অভিবাসীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে, প্রায় ১১ শতাংশ অভিবাসীই কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি। ২৮ শতাংশ অভিবাসী ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন। প্রায় ৪০ শতাংশ অভিবাসী ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত

পড়ালেখা করেছেন, ১২ শতাংশ এসএসসি এবং ৬.৮ শতাংশ এইচএসসি পযন্ত। মাত্র ১ ভাগ অভিবাসী অনার্স কিংবা মাস্টার্স পাশের ডিগ্রীধারী এবং মাত্র ০.৪ ভাগ অভিবাসীর কারিগরি প্রশিক্ষণ বা ডিপ্লোমা রয়েছে।

৪.৩। অভিবাসনের পূর্ব অভিজ্ঞতা

সাধারণত যারা একবার কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন করেন তারা বারবার অভিবাসনের চেষ্টা করে থাকেন। রামরুর গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুয়ায়ী প্রায় ১৩ ভাগ লিবিয়া ফেরত অভিবাসীরই পূর্বে অভিবাসনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। বাকি ৮৭ ভাগ অভিবাসী প্রথমবারের মতো কর্মসংস্থানে বিদেশ গিয়েছিলেন। যাদের পূর্বে অভিবাসনের অভিজ্ঞতা ছিল তাদের মধ্যে ৩৭ ভাগ সৌদি আরবে, ২২.৫ ভাগ আরব আমিরাতে, ১২ ভাগ মালয়েশিয়ায়, ৮ ভাগ সিঙ্গাপুরে, ৫.৭ ভাগ কুয়েতে এবং ১৬ ভাগ ওমান, কাতার, বাহরাইন, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশে কাজ করেছিলেন ।

৪.৪। ফিরে আসা অভিবাসীদের লিবিয়া গমনের পূর্বের পেশা বা বৃত্তি

শতকরা ১৯ জন অভিবাসীই লিবিয়ায় যাওয়ার পূর্বে কৃষিকাজ করতেন। শতকরা ১৩.৫ ভাগ ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ করতেন। লক্ষণীয় যে, ১৪ ভাগ অভিবাসী নির্মাণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত ছিলেন, ১২ ভাগ ছিলেন বেকার এবং ৪.৭ ভাগ অভিবাসী অন্য দেশের অভিবাস জীবন শেষ করে দেশে ফিরে অন্তর্বর্তীকালীন সময় পার করছিলেন। অভিবাসীদের ৫.৬ ভাগের মতো ছাত্রাবস্থায় ছিলেন এবং ২ ভাগের মতো ছিলেন বেকার।

৪.৫। ফিরে আসা অভিবাসীদের জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান

রামরুর গবেষণায় দেখা গেছে, লিবিয়ায় প্রেরিত এবং প্রত্যাবাসিত অভিবাসীগণ বাংলাদেশের ৬৪ জেলারই অন্তর্গত। টাঙ্গাইল, নোয়াখালী ও কুমিল্লা থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অভিবাসী লিবিয়ায় গিয়েছেন। এছাড়া চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মুন্সিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও ঢাকা জেলা থেকেও বহুসংখ্যক লোক লিবিয়ায় গিয়েছেন।[৫] চাঁপাইনবাবগঞ্জ ছাড়া অন্যান্য জেলা থেকে সব সময় অনেক অভিবাসন হয়। মঙ্গাপীড়িত অঞ্চল থেকে ৩% ভাগ লোক সংগ্রহের জন্য রিক্রুটিং এজেন্সীগুলোর বাধ্যবাধকতা থাকায় এবং স্থানীয় এজেন্টদের তৎপরতার কারণেই সম্ভবত চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে আগের তুলনায় বেশি সংখ্যক লোক লিবিয়ায় পাড়ি দিতে পেরেছে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলায় উচ্চ হারে অভিবাসন সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্র হলেও এ জেলা দুটি থেকে তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক লোক লিবিয়ায় গমন করেছেন।

৪.৬। ফিরে আসা অভিবাসীদের জমিজমার মালিকানার চিত্র

বর্তমান গবেষণায় দেখা যায়, ৯.৬ ভাগ অভিবাসীর নিজস্ব বসতভিটা নেই এবং প্রায় ৬৯ ভাগের কোনো আবাদী বা কৃষি জমি নেই। যে ৩১ ভাগ অভিবাসীর আবাদি জমি রয়েছে তাদের অর্ধেকেরও বেশি সংখ্যকের (৫২ ভাগের) জমির পরিমাণ ৫০ শতাংশের নিচে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পারিবারিক মালিকানাধীন রয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, গবেষক Bertocci (1972) বাংলাদেশের দুটি গ্রামে

[৫] রামরু এবং ২২শে মার্চ পর্যন্ত বিএমইটির বিমান বন্দর ডেস্কে নিবন্ধনকৃত লিবিয়া ফেরতদের ডাটাবেজ।

তার নিবিড় পর্যবেক্ষণ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, ৫/৬ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জীবন নির্বাহ উপযোগী উপার্জন করতে কমপক্ষে ২ একর বা ২০০ শতাংশ জমির দরকার হয়।[৬]

সুতরাং ব্যবহারিক দিক থেকে গড়ে ৬.৬ সদস্যের পরিবার বিশিষ্ট লিবিয়া ফেরত অভিবাসীদেরকে ভূমির দিক থেকে দরিদ্র বলা যায়। এছাড়া যাদের বসতভিটা রয়েছে তাদের ২৫ ভাগেরই বসতভিটার আয়তন ৬ শতাংশের মধ্যে ১৯ ভাগ অভিবাসীর ১১ শতাংশ পর্যন্ত এবং ১৬ ভাগ অভিবাসীর ১৬ শতাংশ পর্যন্ত বসতভিটা রয়েছে; ১০ ভাগের কোনো বসতভিটা নেই এবং এরা সরকারের পতিত জমিতে, রেলওয়ের অব্যবহৃত জমি, বস্তিতে এবং আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে অস্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। এসব তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চরম দরিদ্রতম ব্যক্তিটিও, যিনি কিনা ভূমিহীন, কোনো না কোনোভাবে অভিবাসন করছেন।

৪.৭। লিবিয়ায় অভিবাসন প্রক্রিয়াকরণ

গবেষণায় দেখা গেছে, অভিবাসন প্রক্রিয়াকরণ যেমন পাসপোর্ট, ভিসা সংগ্রহ, মেডিকেল চেকআপ, বিমানের টিকিট প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে অভিবাসন ইচ্ছুক ব্যক্তিরা আত্মীয়স্বজন, দালাল, রিক্রুটিং এজেন্টস এবং সরাসরি চাকুরিদাতা কোম্পানির সাথে যোগাযোগ বা পরামর্শ করে থাকেন।

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে, লিবিয়া ফেরতদের ৭ ভাগ আত্মীয়স্বজনদের মাধ্যমে ৬.৭ ভাগ দালালের মাধ্যমে এবং ২৩ ভাগ সরাসরি রিক্রুটিং এজেন্টের মাধ্যমে ভিসা জোগাড় করেছিলেন। আরও দেখা যায় যে, অভিবাসন প্রক্রিয়ায় এখনও দালালদের আধিপত্য ও প্রভাব রয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, সম্প্রতি সরকার দালাল ব্যবস্থা বিলুপ্তি করার আইন প্রণয়নের চিন্তাভাবনা করছে কেননা সরাসরি রিক্রুটমেন্টে তুলনামূলকভাবে অভিবাসন খরচ কম হয়। তবে দালাল ব্যবস্থার উচ্ছেদের ফলে স্বল্পমেয়াদে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের প্রবাহ কমে যাওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে।

৪.৮। লিবিয়ার অভিবাসন খরচ

বর্তমান গবেষণায় পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, শতকরা ২.৫ ভাগ অভিবাসীর লিবিয়া যেতে খরচ হয়েছিল ১ লাখ টাকার মতো, ১৬.৮ ভাগের খরচ হয়েছিল ১ লাখ থেকে ২ লাখ টাকার মতো, ৭৪ ভাগের খরচ হয়েছিল ২ থেকে ৩ লাখ টাকার মতো এবং ৫.৫ ভাগ লোক ৩ থেকে ৪ লাখ টাকার মতো উচ্চ ব্যয়ে লিবিয়ায় গিয়েছিলেন। লিবিয়া যেতে গড়ে অভিবাসন খরচ হয়েছিল ২ লাখ ৪৩ হাজার টাকার মতো। অথচ সরকারি হিসাব অনুযায়ী লিবিয়া যাওয়ার খরচ নির্ধারণ করা হয়েছিল ৮৬ হাজার টাকা। সে হিসেবে রিক্রুটিং এজেন্সী ও দালালদের মাধ্যমে লিবিয়ায়গত অভিবাসীরা নির্ধারিত টাকার অধিক গড়ে প্রায় ১ লাখ ৫৭ হাজার টাকা কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে তারও অধিক উচ্চ খরচে অভিবাসন করেছিলেন। মূলত এ ধরনের উচ্চ খরচ এবং মধ্যস্বত্বভোগীতা বাংলাদেশ থেকে স্বল্পমেয়াদে অভিবাসনের অন্যতম প্রধান সমস্যা। গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য অনুয়ায়ী প্রায় ৯০ ভাগ লিবিয়া ফেরত অভিবাসীই যাওয়ার সময় বিদেশে যাওয়ার খরচ মেটানোর জন্য ধার কিংবা ঋণ করেছিলেন। অনেকে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে, যেমন- আত্মীয়-স্বজন, সুদ-ব্যবসায়ী, এনজিও এবং ব্যাংক থেকে

[৬] Peter J. Bertocci (ed.), *Prelude to crisis; Bengal and Bengal studies in 1970* (East Lansing: Asian Studies Center, Michigan State University, 1972).

এসব ঋণ নিয়েছেন। অনেকেই তাদের সম্পূর্ণ, এমনকি শেষ টুকরো জমি পর্যন্ত বিক্রি বা বন্ধক রেখে টাকা জোগাড় করেছিলেন।

৪.৯। ফিরে আসা শ্রমিকদের লিবিয়ায় কাজের অভিজ্ঞতা

যে কোনো নতুন দেশে পৌঁছার পর অভিবাসীদের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা যেমন- ভিন্ন সংস্কৃতির ধাক্কা, গৃহকাতরতা, খাবার ও বাসস্থানের অপর্যাপ্ততা ইত্যাদির সম্মুখীন হতে হয়। এগুলো ছাড়াও অভিবাসীদের বড় যে সমস্যাগুলো পোহাতে হয় তা হচ্ছে: পার্সপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র বাজেয়াপ্তকরণ, গতিবিধি ও চলাফেরায় নিয়ন্ত্রণ আরোপ, দালাল কর্তৃক চাকুরির ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত পরিত্যক্ত বাড়িতে গৃহবন্দী অবস্থায় দিন কাটানো, চুক্তি ও অঙ্গীকার অনুযায়ী কাজ না পাওয়া, কাজ শুরুর পূর্বে বেতন ও সুযোগ-সুবিধা কম দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় চুক্তিতে বাধ্য করা, নির্ধারিত মজুরির চেয়ে কম মজুরি প্রদান, দালাল কর্তৃক বেতন গ্রহণ, এবং বেতনের জন্য হয়রানি ও শাস্তিমূলক বন্দীত্ব ইত্যাদি। বর্তমান গবেষণাতেও ফেরত আসা অভিবাসীরা তাদের এ ধরনের দুর্ভোগের কথা ব্যক্ত করেছেন। নিচে বর্ণিত কেইস স্টাডি থেকে এরূপ বঞ্চনার একটি চিত্র পাওয়া যায়।

মোখলেসুর রহমান মনছুরের বাড়ি উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলার শাহজানপুরে গ্রামে। তিনি আরও অনেক বাঙালীর সাথে ৪০ জনের একটি দলে ত্রিপোলি বিমানবন্দরে নামেন। তিনি যেই এজেন্সি থেকে লিবিয়ায় গিয়েছিলেন সেখানে ঐ এজেন্সির দুই এজেন্ট- বাবুল ও সাইদ, মনসুরদের সাথে বিমান বন্দরে দেখা করেন। দুজন মিলে সকলের পাসপোর্ট কৌশলে তাদের জিম্মায় নিয়ে নেয়। এরপর সবাইকে ত্রিপোলির উপকণ্ঠে একটি পরিত্যক্ত গুদামে নিয়ে যায় এবং সেখানে অপেক্ষা করতে বলে। বাবুল ও সাইদ তাদের হুমকি দেয় যদি কেউ কোনো নির্দেশ অমান্য করে তবে তাকে নির্বাসিত করা হবে। ঐ গ্রুপের মধ্যে কেউ বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানতো না। মোখলেসুর রহমান তাদের অভিজ্ঞতা বিবরণে বলেন- "একটি নতুন দেশে আমরা পুরোপুরি অসহায় হয়ে পড়ি। না খেয়ে না দেয়ে আমরা দু মাস ঐ গুদামে অন্তরীণ ছিলাম। অবশেষে বাবুল ও সাইদ যখন আমাদের কাজের ব্যবস্থা করে তখন আমরা জানতে পারি আমাদের বেতন তাদের হাতে দেওয়া হবে, আমাদের হাতে নয়। আমাদের চুক্তি অনুযায়ী ৩৬০ ডলার দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এর পরিবর্তে আমাদেরকে মাসিক ২২০ ডলার বেতনের একটি নতুন চুক্তিতে সাক্ষর করতে হয়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যে আমরা মাস শেষে ২২০ ডলারও পেতাম না। বাবুলের কাছেই কোম্পানি বেতন দিত। আমরা প্রত্যেকে মাসে মাত্র ১১০ ডলার করে পেতাম। বাকি টাকা বাবুল থাকা খাওয়ার নামে কেটে নিত।"

৪.১০। বাংলাদেশে শ্রমিকেরা যে সকল কোম্পানিতে কাজ করতেন

বর্তমান গবেষণায় দেখা গেছে, অধিকাংশ বাংলাদেশী শ্রমিকই একের অধিক কোম্পানিতে কাজ করেছেন। বাংলাদেশী ও লিবিয় দালালদের হাতে জিম্মি হয়ে তাদেরকে অনেকটা সময় বসে থাকতে হয়েছে এবং বারবার কোম্পানি পরিবর্তন করতে হয়েছে। এ ধরনের হাজারো ঘটনার নমুনা পাওয়া গেছে। দালালদের খপ্পরে পড়ে অনেকেই নানা ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। অনেকে বিমানবন্দরে গিয়ে বুঝতে পেরেছেন দালাল অন্য আরেকজনের পাসপোর্টে (গলাকাটা পাসপোর্টে) তাকে পাঠাচ্ছেন। কিন্তু নিতান্ত বাধ্য হয়ে অনেককে যেতে হয়। অনেকেই ৩ মাস, ৪ মাস বেতন না পেয়েও কাজ করে গেছেন। মানিকগঞ্জ জেলার খোকন মিঞা আল-নাহার কোম্পানিতে কাজ করতেন। তিনি বলেন, চুক্তি অনুয়ায়ী তার মাসিক বেতন ছিল ২৫০ দিনার কিন্তু ৯ মাস কাজ করে তিনি সর্বসাকুল্যে মোট ৫০০

দিনার পেয়েছেন (১ দিনার বাংলাদেশী টাকায় ৬০ টাকার মতো)। তবে অনেকের ভালো অভিজ্ঞতাও রয়েছে। যারা বাংলাদেশ থেকে সব জেনে শুনে কাজ নিয়ে কোম্পানিকে সরাসরি সাক্ষাৎকার দিয়ে গেছেন তারা বেশ ভালো ছিলেন। তারা মাস শেষে নিয়মিত বেতন পেতেন। নিয়মিত তাদের বেতন পরিবারের সদস্যের নামে দেশে একাউন্টে চলে আসতো। যেমন হুন্দাই, সিনহান, দাইয়্যু, আইএসইড কোরিয়ান এসব কোম্পানিতে কর্মরত শ্রমিকরা লিবিয়ায় বেশ ভালোই ছিলেন। এছাড়া অনেকেই স্বল্প সময়ের জন্য ১-৪ মাস বিভিন্ন কোম্পানিতে সাপ্লাই শ্রমিকের কাজ করেছেন। এভাবে কাজ করতে গিয়ে কাজ ও বেতন পাওয়ার জন্য বেশ কিছু সংখ্যক বাংলাদেশী কর্মী দালাল ও শ্রমিক সাপ্লাইয়ারদের হাতে জিম্মি ছিলেন।

৪.১১। কাজের ধরন

লিবিয়ায় কর্মরত বাংলাদেশী অভিবাসীদের কাজের ধরন হিসেবে দক্ষ, অদক্ষ বা স্বল্প দক্ষ এবং পেশাজীবী এ তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রাপ্ত তথ্যমতে, বাংলাদেশী শ্রমিকদের বেশিরভাগই নির্মাণ কাজ করতেন। এদের মধ্যে রাজমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রী, সিরামিক্স ও টাইল্সমিস্ত্রী, স্টীল ফিক্সার, রড বাইন্ডার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, পাইপের মিস্ত্রী, সাটারিংয়ের মিস্ত্রী, রং মিস্ত্রী ছিলেন অনেকেই। এছাড়াও বাবুর্চী, সিকিউরিটি গার্ড, মালি, নার্স, সেল্সম্যান, ড্রাইভার এসকল ক্যাটাগরীতে কাজ করতেন অল্প সংখ্যক শ্রমিক। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রশাসনিক পর্যায়ে যেমন– কোম্পানির সুভারভাইজার, ফোরম্যান, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করা বাংলাদেশী শ্রমিকদের সংখ্যাও ছিল হাতে গোণা। এছাড়া অনেকেই স্বল্প সময়ের জন্য ১-৪ মাস বিভিন্ন কোম্পানিতে চাহিদা অনুযায়ী অস্থায়ীভাবে সাপ্লাই শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছেন। সাপ্লাই শ্রমিক হিসেবে যারা কাজ করেছিলেন তাদের অধিকাংশই দালাল ও শ্রমিক সরবরাহকারীদের হাতে বেতনের জন্য জিম্মি ছিলেন এবং প্রতারিত ও ভোগান্তির শিকার হয়েছিলেন।

যদি লিবিয়ায় কর্মী হিসেবে বেশিসংখ্যক নারী পাড়ি জমাননি তবুও ফেরত আসা ১৫৭ জনের মধ্যে বেশিরভাগই নার্স হিসেবে কর্মরত ছিলেন।[৭] এছাড়া কিছুসংখ্যক কর্মী সেলাইকর্মী এবং বাকিরা সেল্সম্যান হিসেবে কাজ করতেন।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, কোরিয়ান কোম্পানি সিনহান, হুন্ডাই,দাইয়্যু, আইএসইউ, ওন কনস্ট্রাকশনস, চায়নিজ কোম্পানি - বেইজিং কোম্পানি অব চায়না, CGGC, CSCE কোম্পানিতে ও অনেক শ্রমিক কাজ করেছেন। এছাড়া স্থানীয় লিবিয় এবং মধ্যপ্রাচোর বিভিন্ন কোম্পানিতে যেমন- আল-নাহার, আল ইসকান, রামকো কাতারিয়া, আল-মোহব, আল রিযাদ, সরিকা আল তালিদ লিবিয়া, আমোনা রানহিল, হানিল ইঞ্জি এন্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি ইত্যাদি প্রায় একশ'রও অধিক কোম্পানিতে প্রায় ৩৬ ভাগ বাংলাদেশী শ্রমিক কর্মরত ছিলেন। এসকল কোম্পানিতে অধিকাংশ শ্রমিকরাই বেশ দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। এছাড়া ইন্ডিয়ান MSDI, DS (ডিএস) কোম্পানিতে শ্রমিকরা কাজ করতেন যাদের অধিকাংশরই বেতন ভাতা ছিল খুবই কম এবং অনেকেরই ৭/৮ মাস কিংবা তারও অধিক বেতন বকেয়া ছিল এসব কোম্পানীতে। ইউরোপীয়ান কোম্পানী যেমন- ইটালীয় বোনআতি কোম্পানী, তুর্কী কোম্পানী প্রভৃতিতেও বাংলাদেশী শ্রমিকরা কাজ করতেন।

---

[৭]The Financial Express; "Project to support women returnees from Libya planned," Wednesday, June 15, 2011.

৪.১২। শ্রমিকদের মাসিক বেতনের কাঠামো

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে, বাংলাদেশী শ্রমিকদের একাংশ প্রথম ৩ থেকে ৪ মাসের বেতন পাননি। অনেকেই প্রাপ্য বেতনের চেয়ে কম বেতন পেয়েছেন। ১০০০০ জনের উপর জরিপের তথ্য অনুযায়ী গড়ে তাদের মাসিক বেতন ছিল বাংলাদেশী ২৪,০০০ টাকার মতো। এদের মধ্যে ৫.৬ ভাগ ১০,০০০ টাকার নিচে বেতন পেতেন। প্রায় অর্ধেক (৫০ ভাগের মত) কর্মী ১০-২০ হাজার টাকার মতো বেতন পেতেন, ৩১ ভাগ শ্রমিক ২০-৩০ হাজার টাকার মত বেতন পেতেন এবং ১২ ভাগ শ্রমিকের বেতন ছিল ৩২- ৫০ হাজার টাকার মধ্যে। শ্রমিকদের ভাষ্যমতে, অনেকেই প্রায় প্রতি মাসের অর্ধেকের চেয়েও বেশি দিনে ওভারটাইম করেছেন। কিন্তু ওভারটাইমের বেতন প্রদানের আশ্বাস দিয়েও পরবর্তীতে দেওয়া হয়নি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অভিবাসী শ্রমিকরা গন্তব্য দেশে পৌছামাত্রই বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মূখীন হচ্ছেন। এসকল সমস্যার মূলে রয়েছে তাদের নিজেদের করা কিছু ভুল এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক সংস্থা এবং ব্যক্তিবর্গের অতিরিক্ত ব্যবসায়িক লোভ এবং শোষণ। মধ্যস্থতাকারী, দালাল এবং গন্তব্য দেশে কর্মরত এজেন্সির লোকজন ও ভিনদেশী দালালরাও এ শোষণ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। লিবিয়ায় শ্রমিক প্রেরণেও এ ধরনের ভয়াবহ চিত্র ফুটে ওঠেছে। ডিম্যান্ড লেটারে উল্লেখিত শ্রমিকের চেয়ে অতিরিক্ত শ্রমিক সংগ্রহ ও নিয়োগ এবং ভুয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে এভাবে লোক পাঠানো বন্ধ না হলে বাংলাদেশের শ্রমবাজার ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। এসবের ফলে নিয়োগকারী দেশ কর্তৃক বিবিধ নিষেধাজ্ঞা আরোপ হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

৫। লিবিয়াতে গণঅভ্যুত্থান এবং পরিস্থিতির শিকার অভিবাসী শ্রমিকগণ

লিবিয়ায় গণঅভ্যুত্থান এবং সরকার পরিবর্তনের আন্দোলন শুরু হয় ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে; যদিও এর সূত্রপাত হয়েছিল জানুয়ারি মাসে। সরকার পরিবর্তন এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলন অল্পকিছু দিনের মধ্যেই সরকারের বিরোধী এবং বিদ্রোহীদের সাথে সরকারের অনুগত বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে রূপ নেয়। ফলে আইন-শৃঙ্গলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে এবং নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সাধারণ জনগণের জীবন জীবিকা ব্যাপক হুমকির মুখে পড়ে এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে পুরোপুরি অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। লক্ষণীয় যে, উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে লিবিয়াতেই সবচেয়ে বেশি অভিবাসী শ্রমিক কাজ করে। ২০১১ এর পরিসংখ্যান মতে লিবিয়ার ৬.৫ মিলিয়ন বসবাসকারী মধ্যে ১.৫ মিলিয়ন লোকই বিদেশী শ্রমিক।[৮]

আরও দেখার বিষয় হলো, অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করতে বিদ্রোহীরা বিশেষ করে বিদেশী কোম্পানিগুলোকেই আক্রমণের জন্য লক্ষবস্তু হিসাবে নির্ধারণ করে। আবার এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কিছু দুষ্কৃতিকারী এবং সুবিধাবাদী বিদেশী কোম্পানিগুলোতে হামলা চালিয়ে মূল্যবান সম্পদ লুট করে এবং কোম্পানিগুলোর বিভিন্ন সাইটের পাশে নির্মিত ক্যাম্পগুলোতে হামলা চালিয়ে বিদেশী কর্মীদের অস্ত্রের মুখে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে তাদের টাকা পয়সা, মোবাইল, কম্পিউটার ও অন্যান্য মূলবান মালামাল কেড়ে নেয়। এভাবে অভিবাসী শ্রমিকরা এসব পরিস্থিতির শিকার হয়ে সর্বস্বান্ত হয়।

---

[৮]সূত্র: http:/www.ion.int/jahia/jaha/media/prss.bricting notes.

লিবিয়াতে মিশর এবং তিউনিসিয়া থেকে আগত শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। এছাড়া আফ্রিকার অন্যান্য দেশ যেমন, মলদোকা, মন্টেনিগ্রো, চাঁদ, নাইজার, সুদান, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, ভারত,বাংলাদেশ, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার শ্রমিকরাও সেখানে কাজ করতেন।

যখন আন্দোলনকারীরা লিবিয়ায় বিভিন্ন শহর নিজেদের দখল নেওয়া শুরু করে তখন অধিকাংশ বিদেশী কোম্পানি লিবিয়া ছাড়া শুরু করে। অন্যান্য দেশের নাগরিকদের মত বাংলাদেশী নাগরিকদের জীবনও সেসময় ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। তাদের টাকা পয়সা ও মূল্যবান সম্পদ সব লুট হয়ে যায়। ত্রিপোলির আশেপাশে অনেক শ্রমিক আহত হয়। অনেকেরই পাসপোর্ট কোম্পানির কাছে জমা ছিল। কিন্তু পরিস্থিতির এত দ্রুত ক্রমাবনতি ঘটে যে শ্রমিকরা পাসপোর্ট ফেরত নিতে পারেনি। এছাড়া সেসময় ব্যাপক হারে দিনের বেলা বিভিন্ন এলাকায় কার্ফ্যুও জারি করা হয়েছিল।

এসব থেকে জরুরি পরিস্থিতির উদ্ভব হলে বিভিন্ন দেশের অভিবাসীরা জীবনের নিরাপত্তাতহীনতায় ভোগেন। এ অবস্থায় সবাই লিবিয়া ছেড়ে পাশ্ববর্তী তিউনিসিয়া সীমান্তের দিকে ছুটতে থাকে। বাংলাদেশী শ্রমিকরাও বর্ডারের পাশে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। সেখানে পাসপোর্ট না থাকায় অনেক বাংলাদেশী শ্রমিক বর্ডারে (তিউনিসিয়া) ঢুকতে পারেনি। বাংলাদেশ দূতাবাস শ্রমিকদের বিকল্প পরিচয়পত্র সরবরাহ করতে দেরী করায় অনেকেই বর্ডারে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন। শ্রমিকদের অনেকেই অভিযোগ করেছেন অন্যান্য দেশের দূতাবাস জরুরি ভিত্তিতে নাগরিকদের সহায়তার ব্যবস্থা নিয়েছিল এমনকি পাশ্ববর্তী দেশ নেপালের মিশনও দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু বাংলাদেশের দূতাবাস পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

এর ফলে বাংলাদেশী শ্রমিকগণ চরম মানবিক সংকটের মুখোমুখি হন। না খেয়ে অনাহারে সীমান্তের ক্যাম্পে খোলা আকাশের নিচে তারা ২০/২২ দিন কিংবা তারও বেশি সময় ধরে চরম দূর্দশায় দিন কাটান। এ অবস্থা চলতে থাকলে বাংলাদেশ সরকার গত ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে আইওএমকে বাংলাদেশী শ্রমিকদের সহযোগিতার জন্য আহবান জানায়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বাংলাদেশের সরকার, আইওএম ইউএইচসিআর প্রভৃতি সংস্থাসমূহ বাংলাদেশী শ্রমিকদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে এগিয়ে আসে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সরকারি হিসাবে জরুরি পরিস্থিতিতে সেসময় প্রায় ৩৬,৬৮৩ জন বাংলাদেশী অভিবাসী লিবিয়া থেকে দেশে ফিরে আসেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ কোম্পানির উদ্যোগে কেউ কেউ নিজ উদ্যোগে দেশে ফিরেন।

৬। জরুরি ভিত্তিতে দেশে ফেরার বিরূপ প্রভাব

লিবিয়া ফেরত অধিকাংশ বাংলাদেশী শ্রমিকই তাদের টাকা-পয়সা ও চাকুরি ছেড়ে খালি হাতে দেশে ফিরেছেন। অভিবাসীদের এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবাসনের ফলে তাদের পরিবার এবং সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্র মারাত্নক অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

৬.১। কাজ করার সুযোগ নষ্ট

চাকুরির থেকে এভাবে অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে আসায় এসব কর্মীর নি:সন্দেহে বেশ কয়েকটি বছর কাজ করার সুযোগ হারাতে হয়েছে। লিবিয়া শ্রমিকদের কাজ করার মেয়াদ বছরে বছরে নবায়ন

করা হতো। অধিকাংশ শ্রমিকেরই কাজের ধরন অনুযায়ী বলা যায় চুক্তির মেয়াদ কমপক্ষে ২০১৩/২০১৪ পর্যন্ত কিংবা তারও অধিক বহাল থাকতো। কেননা ২০০৮ সালে লিবিয়া সরকার ১৩০ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে পাঁচ বছর মেয়াদি অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনা ঘোষণা করে। ২০০৮ সালের শুরু হওয়া পাঁচ বছরব্যাপী উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় লিবিয়ার সরকার ৩ লাখ বাড়ি, ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয় কমপ্লেক্স, দশ হাজার কিলোমিটারের অধিক রাস্তা নির্মাণ এবং ২৪ হাজার কিলোমিটার রাস্তার ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। উদ্ভূত পরিস্থিতির সৃষ্টি না হলে এটা অনুমান করা যায় যে লিবিয়া সরকার ঘোষিত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার যথাযথ সম্ভাবনা ছিল। যারা ফিরে এসেছেন তাদের অধিকাংশই ২০০৮ পরর্বতী সময়ে লিবিয়ায় গিয়েছিলেন। প্রত্যেকেই বিপুল অংকের টাকা খরচ করে লিবিয়া পাড়ি জমিয়েছিলেন এবং তারা সেখানে কয়েক বছর কাজ করতে পারবেন বলে প্রত্যাশা করেছিলেন। আকস্মিক প্রত্যাবর্তন তাদের পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগের আশা নস্যাৎ করে দিয়েছে।

৬.২। লিবিয়ায় অবস্থানকালীন সময়

রামরুর অনলাইন জরিপে অংশ নেওয়া প্রায় ২,৫০০ কর্মীর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, প্রায় ২৩ ভাগ শ্রমিক ১ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত লিবিয়ায় ছিলেন, ২৮ ভাগ শ্রমিক ১ বছর কিংবা তার কম সময় লিবিয়াতে ছিলেন, ৩৬.৫ ভাগ শ্রমিক ১ বছরের বেশি কিন্তু ২ বছরের কম সময় ধরে কাজ করেছেন এবং মাত্র ২.৬৩ ভাগ কর্মী তিন বছর বা তার অধিক সময় লিবিয়াতে অবস্থান করেছিলেন এবং ফিরে আসা শ্রমিকেরা মাথাপিছু গড়ে ১৭ মাস লিবিয়াতে অবস্থান করেছেন। গুণগত বিশ্লেষণ করলে আরও দেখা যায়, এদের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক সরাসরি লিবিয়া যাওয়ার পর চাকুরি পায়নি। অনেক শ্রমিককেই গড়ে তিন-চার মাস চাকুরি না পাওয়া পর্যন্ত সময় কাটাতে হয়েছে। ফেরত আসা শ্রমিকদের মাসিক আয়ের তথ্য থেকে জানা যায়, প্রায় ৪৮ ভাগেরই বেতন ছিল ১৫,০০০ টাকার মতো। যদি আমরা প্রথম ৪ মাস বাদ দিই তাহলে শ্রমিকদের কর্মরত থাকার সময় পাওয়া যায় মোট ১৩ মাস। সে হিসাবে মাসে ১৫,০০০ টাকা করে তারা ১৩ মাসে মোট আয় করার কথা ১,৯৫,০০০ টাকা, কিন্তু লিবিয়ায় যাওয়ার পেছনে প্রত্যেক শ্রমিকের গড়ে খরচ হয়েছিল প্রায় ২,৪৩,০০০ টাকার মতো। তার ওপর যদি তাদের থাকা খাওয়ার খরচ বাদ দেওয়া হয় তাহলে এটি উপলব্ধি করা যায় যে, অধিকাংশ শ্রমিকই তাদের বিদেশ যাওয়ার খরচই তুলতে পারেননি। এর মধ্যে ৬ ভাগ শ্রমিক রয়েছেন যাদের মাসিক বেতন ছিল ১০,০০০ টাকার নিচে। তারা যা আয় করেছেন তা দিয়ে অভিবাসন খরচের অর্ধেকও তুলতে পারেননি। ফিরোজ মিয়া নামে একজন অভিবাসী তার দুর্দশার কথা বলেছেন এভাবে - "আমি লিবিয়াতে ১৬ মাস ছিলাম। আমি লিবিয়াতে ২ লাখ ৬৫ হাজার টাকা খরচ করে গিয়েছিলাম, আমি মাত্র ১৮০ লিবিয়ান দিনার বেতন পেতাম যা বাংলাদেশী টাকায় ১০,৫০০ টাকার মতো। আমি ১৬ মাস কাজ করে আমার যাওয়ার খরচের অর্ধেকও তুলতে পারিনি। কারণ আমার নির্দিষ্ট কোনোও কোম্পানি ছিল না। আমি ছয় মাস কাজ করে প্রায় ছয় মাস বসে ছিলাম। কিন্তু তারপরও আমি সেখানে থাকতে চেয়েছিলাম আমার খরচ উঠানোর জন্য।"

৬.৩। ঋণের পরিমাণ

গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য অনুয়ায়ী প্রায় ৯০ ভাগ লিবিয়া ফেরত অভিবাসীই যাওয়ার সময় বিদেশে যাওয়ার খরচ মেটানোর জন্য ধার কিংবা ঋণ করেছিলেন। অনেকে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে, যেমন -

আত্মীয়-স্বজন, সুদ-ব্যবসায়ী এবং ব্যাংক থেকেও এসব ঋণ নিয়েছেন। অনেকেই তাদের সম্পূর্ণ, এমনকি শেষ টুকরো জমি পর্যন্ত বিক্রি বা বন্ধক রেখে টাকা জোগাড় করেছিলেন। তারা ঋণ নিয়েছেন কারণ তারা আশা করেছিলেন যে বিদেশে গিয়ে উপার্জন করে এ ঋণ পরিশোধ করবেন। কিন্তু অধিকাংশ অভিবাসীর ঋণই দু:স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। খুব অল্প সংখ্যক শ্রমিক, যারা তুলনামূলকভাবে বেশি সময় ধরে অবস্থান করেছেন, তারা কিছুটা ঋণ পরিশোধ করতে পেরেছেন। ঋণের পরিমাণ বা অবস্থার তথ্য থেকে দেখা যায়, ৮৭ ভাগ লিবিয়া ফেরত বাংলাদেশী কর্মী বর্তমানে ঋণগ্রস্ত রয়েছেন। আরও দেখা গেছে, ১৬ ভাগ লিবিয়া ফেরত শ্রমিকের ৭৫,০০০ টাকার মতো, ২২ ভাগের ৭৫,০০০-১,০০,০০০ টাকার মতো এবং বাকি ২৫ ভাগের ১ লাখ থেকে দেড় লাখ টাকার মতো ঋণ রয়েছে। গড়ে অভিবাসীদের ১,৪৩,০০০ টাকার মতো ঋণ রয়েছে ।

৬.৪। সঞ্চয়

প্রায় ৮১.২ ভাগ লিবিয়া ফেরত বাংলাদেশী কর্মী জানিয়েছেন লিবিয়াতে তাদের কোনো সঞ্চয় ছিল না। অর্থাৎ ১৮.৮ ভাগের মতো কর্মী জানিয়েছেন কোম্পানির কাছে তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পয়সা রয়েছে।

৬.৫। বকেয়া বেতন

প্রায় ৮৭.৮ ভাগ ফিরে আসা অভিবাসী জানিয়েছেন তাদের কিছু বেতন লিবিয়াতে বকেয়া আছে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার পাশাপশি কর্মরত অবস্থায় ঠিকমতো বেতন না পাওয়া, দালাল কর্তৃক বেতন আত্মসাৎ করা ইত্যাদি কারণেই অধিকাংশ শ্রমিকের বেতন বকেয়া ছিল। লিবিয়া ফেরত ৩৮ ভাগ শ্রমিকের ৩ থেকে ৫ মাসের এবং ১২ ভাগ শ্রমিকের ৬ থেকে ৮ মাসের বেতন বকেয়া ছিল। এছাড়া ৩.৪ ভাগ অভিবাসী ৮ মাস কিংবা তার অধিক সময় ধরে বেতন পাননি। অবশ্য পরবর্তীতে অধিকাংশ কোরিয়ান কোম্পানি যেমন হুন্ডাই, দাইয়্যু, সিনহান, আইএসইউ, ওন কনস্ট্রাকশনস, এবং কতিপয় চায়নিজ ও ইউরোপীয়ান কোম্পানি তাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ফেরত পাঠিয়েছে বলে অনেক লিবিয়া ফেরত অভিবাসী জানিয়েছেন। কিন্তু বেশিরভাগ কোম্পানিই বিশেষ করে লিবিয়, আরবীয়, ইন্ডিয়ান কোম্পানিসমূহ শ্রমিকদের ন্যায্যপ্রাপ্য বকেয়া বেতন ফেরত পাঠায়নি কিংবা সরকার থেকে কার্যত কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

৭। দেশে ফিরে আসার পর বর্তমান অবস্থা

আকস্মিক দেশে ফিরে বর্তমানে বহু সংখ্যক অভিবাসী বেকার অবস্থায় আছেন। গবেষণাকালীন সময় ৪৬ ভাগই পুরোপুরি বেকার অবস্থায় ছিলেন। বাকিরা আংশিক কিংবা সার্বক্ষণিকভাবে কাজের সংস্থান পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। রামরুর গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে, কর্মরতদের ২৬ ভাগই কৃষিখাতে জড়িত যাদের মধ্যে কেউ কৃষিশ্রমিক, কেউ বর্গাচাষী, কেউবা নিজ জমিতে চাষ করে কোনো রকম বেঁচে আছেন বলে জানিয়েছেন। এছাড়া ২০ ভাগ নির্মাণ খাতে রাজমিস্ত্রি, যুগালী বা শ্রমিক, কাঠমিস্ত্রি, রড বাইন্ডার, পেইন্টার, টাইলস মিস্ত্রি প্রভৃতি পেশায় নিয়োজিত আছেন, ৩ ভাগ ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করছেন এবং ১১ ভাগ গ্রাম বা শহর এলাকায় দিনমজুর হিসেবে কাজ করছিলেন। আরও ১১ ভাগ লিবিয়া ফেরত অভিবাসী পারিবারিক ব্যবসা বা উদ্যেগের সাথে জড়িত আছেন বলে

জানিয়েছেন। বাকিরা ছোটখাট কর্মে বা আত্মকর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট পেশায় যেমন, ছোট-খাটো ব্যবসা, মাছ চাষ প্রভৃতি কাজে জড়িত আছেন। প্রায় ১ ভাগ (সংখ্যায় ৪৫/৪৬ জনের মতো) লিবিয়া ফেরত নিজেদের সামর্থ্যে কাতার, দুবাই, ওমান প্রভৃতি দেশে পুনরায় অভিবাসন করেছেন বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে। এবং ৬০০ জন জানিয়েছিলেন তারা বিদেশ যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। তবে অধিকাংশ অভিবাসীই মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন। ঋণ ও ধার-দেনায় জর্জরিত হয়ে তারা চরম দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছেন।

৮। লিবিয়া ফেরতদের পুনর্বাসন

অভিবাসী শ্রমিকরা বাংলাদেশের সোনার সন্তান। তাদের কর্মপ্রচেষ্টা এবং প্রেরিত রেমিট্যান্স বাংলাদেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেছে। লিবিয়াতে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হওয়ায় তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। কেউ কেউ শত দুর্দশার পরেও পরিবারের খরচ, দায়-দেনা প্রভৃতি কারণে চরম ঝুঁকি নিয়েও সেখানে রয়ে গেছেন।[৯] আর যারা দেশে ফিরে এসেছেন তারা বর্তমানে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে তাদের সিংহভাগই (৯৩.৩ ভাগ) পুনরায় বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন এবং ৬.৭ ভাগ আতঙ্কজনিত কিংবা বার্ধক্যজনিত কারণে অথবা দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকায় বিদেশ যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

অনেকেই দেশে সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি খুঁজছেন। কেউ কেউ ছোট খাটো ব্যবসা বা আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ঋণ নিয়ে মৎস্য চাষ, পোল্ট্রি ফার্ম গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। যেহেতু বেশিরভাগই নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে লিবিয়াতে কাজ করেছেন সেহেতু দেশে ফিরে তারা সেভাবে কাজ পাচ্ছেন না। একদিন কাজ পান তো কয়েকদিন বসে থাকেন। দেশে বর্তমান নির্মাণ শিল্প-ব্যবসাতেও মন্দাভাব বিরাজ করায় এদের কর্মসংস্থান হচ্ছে না। তার উপর পরিবারের খরচ, ঋণের টাকা পরিশোধ, এসকল চাপ তো রয়েছেই। রামরু গবেষণা পরবর্তী সময়ে লিবিয়া ফেরত শ্রমিকদের কাজের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কয়েকটি ক্যাটাগরি করে যোগাযোগের নাম্বারসহ একটি স্কিলবেজ ডাটাবেজ তৈরি করেছে যা চাহিদা মাফিক যে কোনো সংস্থার জন্য কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাপ্তিযোগ্য করা হয়েছে। ইতিপূর্বে লিবিয়া থেকে বাংলাদেশী অভিবাসীদের ফেরত আসার প্রাক্কালে ব্যবসায়ীদের সংগঠন এফবিসিসিআই ও রপ্তানিকৃত তৈরি পোশাক নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন বিজিএমইএ লিবিয়া ফেরত অভিবাসীদের কাজের সুযোগ প্রদানের অঙ্গীকার

[৯]সরকারি হিসাবে গৃহযুদ্ধের পূর্বে প্রায় ৬০,০০০ বাংলাদেশী লিবিয়ায় ছিলেন। এর মধ্যে প্রায় ৩৬,৬৮৩ বাংলাদেশী অভিবাসী দেশে ফিরে আসেন। সে হিসেবে প্রায় ২৩,০০০ বাংলাদেশী গৃহযুদ্ধের সময় লিবিয়াতে অবস্থান করেছেন। এদের অনেকে থেকে গেছেন আবার অনেককে জোর করে থাকতে বাধ্য করেছে বিদ্রোহীরা। কারণ লিবিয়া থেকে লাখ লাখ কর্মী চলে যাওয়ায় সেখানে সেবা প্রদানকারী সংস্থা, হাসপাতাল, ক্লিনিকে ব্যাপক কর্মী সংকট দেখা দিয়েছিল। এদের দিয়ে এসব কাজ করানো হয়। আবার অনেক বাঙালী পাশ্ববর্তী দেশেও আশ্রয় নিয়ে থাকতে পারেন। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে জানা গেছে হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন স্থানে আটকে পড়া অবস্থায় ছিলেন। বিশেষ করে লিবিয়ার দক্ষিণের শহর সেবহা, গাতরুমে অনেকেই অন্তরীণ রয়েছেন বলে জানা যায়। তদুপরি বেনগাজী, ত্রিপোলী, মিসরাতা, সিরতে ও অন্যান্য শহরে আটকে থাকা বাংলাদেশীরা কি অবস্থায় আছেন, যুদ্ধকালীন সময় কতজন হতাহত হয়েছেন তার প্রকৃত তথ্য জানা যায়নি কিংবা প্রকাশ করা হয়নি।

করেছিল।[১০] সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বা যেহেতু তাদের কাজের দক্ষতা রয়েছে তাই রিহ্যাব, বিজিএমইএ, এফবিসিসিআই, জি-ফোর সিকিউরিটি সার্ভিস ও চেইন রেস্টুরেন্টগুলোতে লিবিয়া ফেরত শ্রমিকদের কর্মের সুযোগ দেয়া উচিত। তবে বেশির ভাগ শ্রমিকই আশায় বুক বাঁধছেন লিবিয়ার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুনরায় লিবিয়ায় ফেরত যাবেন।

৯। লিবিয়ায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন ও বর্তমান পরিস্থিতি

প্রায় ৮ মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে লিবিয়াতে গাদ্দাফী সরকারের পতন ঘটে। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১১ সালে জাতিসংঘ লিবিয় অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদকে লিবিয়ার আইনগত কর্তৃপক্ষ হিসেবে অনুমোদন প্রদান করে। অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধের সমাপ্তি ও লিবিয়ার স্বাধীণতা ঘোষণা করে। তৎপরবর্তী সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কিছুটা স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে সমর্থও হন যদিও তা দীর্ঘদিন বজায় থাকেনি। যুদ্ধপরবর্তী সময়ে লিবিয়াতে কিছুটা পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। কোরিয়ার দাইয়্যু কোম্পানি, ইতালীর বোনাতি কোম্পানি, লিবিয়ার ইলিপিও এবং অন্যান্য বড় কোম্পানিতগুলোও তাদের প্রজেক্টগুলো পুনরায় চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং তাদের কর্মীদের ফিরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে[১১] এবং সে সময় কতিপয় বাংলাদেশী শ্রমিকও তাদের পুরনো কোম্পানিতে কাজের সুযোগ নিয়ে ফিরে যান। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উত্তর আফ্রিকার দেশটি অন্ত:কোন্দল এবং আঞ্চলিক বিভক্তির সম্মুখীন হয় এবং সে থেকে এখনো অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে। দেশটি এখন স্থানীয়, গোত্রীয়, আঞ্চলিক, ধর্মীয় প্রভৃতি একাধিক কর্তৃত্ব ও মিলিশিয়া বাহিনী কর্তৃক শাসিত এবং দেশটিতে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার পরিস্থিতির বিপর্যয় ঘটেছে। তবে বাংলাদেশের জন্য দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো রাজনৈতিক অস্থিতিশিলতার বৃত্তে আক্রান্ত লিবিয়ার শ্রমবাজারের সম্ভাবনা ও সুযোগ নষ্ট হওয়া যা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নি:সন্দেহে বাংলাদেশের জন্য একটি আকর্ষণীয় ও উদীয়মান শ্রমবাজারের ক্ষেত্র হতে পারতো। লিবিয়ায় পুনরায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে না আসা পর্যন্ত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজে গতি আসবে না এটা বলাই যায়। তবে যখনই সে অবস্থার সৃষ্টি হবে বাংলাদেশের উচিত হবে দ্রুততার সাথে কর্মকর্তা পর্যায়ে বারবার আলাপ আলোচনা ও দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে ফেরত আসা কর্মীদের পুনরায় লিবিয়ায় পাঠানো এবং নতুনভাবে কর্মী পাঠানোর ব্যাপারে বন্দোবস্ত করা।

১০। সামগ্রিকভাবে অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় এবং বর্তমান প্রেক্ষিতে করণীয়সমূহ

প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং লিবিয়ার অভিবাসী কর্মীদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সময়ের প্রয়োজনে অভিবাসী সমস্যার সময়োপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ভবিষ্যতে যেন বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের এসব সমস্যার দক্ষ ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয় তাই নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে জোর দেয়া প্রয়োজন।

---

[১০] The Financial Express "Businesses promise jobs for Libya returnees" Friday, March 11, 2011. The Daily Star; "Bangladesh garment industry to ensure employment of returnees from Libya" March 17, 2011।

[১১] দ্যা ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ঢাকা, ১৯ নভেম্বর ২০১১।

- ভবিষ্যতে এরকম সংকট উত্তরণে ও সঠিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে যথাযথ প্রক্রিয়াতে আন্তর্জাতিক অভিবাসী কর্মীদের নিয়োগ সম্পন্ন ও প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জনের বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। এই পদক্ষেপ ভবিষ্যতে অভিবাসী কর্মীদের অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক অভিবাসী কর্মীদের লভ্যাংশ ও প্রবাহ দুইই বৃদ্ধি পাবে।

- এছাড়া সাব-এজেন্টস পদ্ধতিটিকেও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। সাব-এজেন্টসদের মাধ্যমে অভিবাসন পদ্ধতির গোটা বিষয়টিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে অনেক না জানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বের হয়ে আসবে।

- যেসব প্রত্যাবাসিত অভিবাসী বিভিন্ন বিষয়ে প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করেছেন কিন্তু বর্তমানে দেশে ফিরে বেকার জীবনযাপন করছেন তাদের জন্য বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক কোম্পানির মাধ্যমে দ্রুত পুনর্বাসন ও চাকুরির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তারা লিবিয়া থেকে দক্ষতা, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে এসেছেন। যেহেতু বেশিরভাগ কর্মীই বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে (ভবন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানে) কর্মরত ছিলেন সেহেতু তারা এ কাজে দক্ষতা অর্জন করেছেন। চাকুরিরত অবস্থায় নিয়মিত কাজে নিয়োজিত থাকায় তাদের দক্ষতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তারা বেকার ও হতাশ জীবনযাপন করছে। সুতরাং যত দ্রুত সম্ভব তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- বৈদেশিক চাকুরি গ্রহণের ক্ষেত্রে অভিবাসীদের সাথে সরকারের যোগাযোগ সৃষ্টি।

- লিবিয়া ফেরত অভিবাসীদের স্কিলবেজ ডাটাবেজ থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, এনজিও ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে দেয়া চাকুরি সংক্রান্ত পত্রিকা ও ইন্টারনেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিগুলোর নিরিখে এসব চাকুরির সাথে অভিবাসীদের দক্ষতার সামঞ্জস্য রেখে তাদেরকে চাকুরিতে আবেদনে সাহায্য করতে বিএমইটিকে নিয়োজিত করা যেতে পারে।

- বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থাও অভিবাসীদের সাহায্যে উৎসাহ দেখিয়েছে। অভিবাসীদের সরাসরি আর্থিক সাহয্যের চেয়ে বরং এসব সহায়তা অভিবাসীদের পুনরায় বিদেশ গমনে ব্যবহার করা যেতে পারে।

- প্রবাসী ব্যাংক থেকে প্রত্যাবাসিত অভিবাসীদের আর্থিক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান তৈরিতে সাহায্য করতে হবে। যেসকল অভিবাসীর কৃষিজমি রয়েছে তাদেরকে কৃষি ঋণের মাধ্যমে সহায়তা করা যায়। যাদের হাতে পুঁজি রয়েছে তাদেরকে ব্যবসা বিষয়ক পরামর্শদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়া যেতে পারে। যদি ব্যবসা ব্যাবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয় তবে অভিবাসীদের জন্য সে ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

- চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। প্রত্যাবাসিত অভিবাসীদের মধ্যে অনেকেই এমন রয়েছেন যারা লিবিয়াতে খুব বেশিদিন ছিলেন না। এই

অভিবাসীদেরকে বিএমইটির টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি) বা অন্য কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় বর্তমান শ্রমবাজারে চাহিদা রয়েছে এমন ধরনের ট্রেড বা কর্মের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেনিংয়ের সুযোগ দেয়ার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা যেতে পারে। সরাসরি আর্থিক সাহায্যের চেয়ে এসব বৃত্তিমূলক পদক্ষেপ বরং অভিবাসীদের নতুন চাকুরি পেতে বেশি সহায়ক হবে।

- বাংলাদেশকে তার মধ্যেপ্রাচ্যের শ্রমবাজার পুনরুদ্ধারকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে। এই বিপুল কর্মক্ষেত্র হাতছাড়া হয়ে গেলে তার পরিণতি হবে খুবই ভয়াবহ। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধা ও সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা নিরসনের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করে হলেও বাংলাদেশকে তার এই বিশাল অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ করতে হবে।

১১। উপসংহার

বর্তমান সময়ে ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব ও বাস্তবতার প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক অভিবাসী ইস্যুটি বাংলাদেশের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ২০০৯ সালের শুরু থেকেই বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে অভিবাসী প্রেরণের হার মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০১১ সালে লিবিয়া থেকে প্রায় ৩৬,৬৮৩ জন অভিবাসীর অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবাসন দেশের অর্থনীতিতে এক বিরাট আঘাত হেনেছে। বর্তমানে এই প্রত্যাবাসিত অভিবাসীদের আভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিকভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এদের প্রায় সকলেই আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য কাজের খোঁজে বিদেশ পাড়ি দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো কিছু পাওয়ার আগেই লিবিয়ার রাজনৈতিক সঙ্কট এদেরকে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য করেছে। এ মুহূর্তে জনশক্তি রপ্তানি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলো দ্রুত ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক এসব অভিবাসীদের আভ্যন্তরীণ পুনর্বাসন কিংবা অন্য কোনো দেশে পুন:প্রেরণের ব্যবস্থা করা। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোরও এসব ক্ষেত্রে জরুরি ভিত্তিতে অভিবাসীদের জন্য চাকুরি বা নগদ অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা করা উচিত। কেননা বেকারত্ব থেকেই পারিবারিক ও সামাজিক অশান্তির সৃষ্টি হয়।

সম্প্রতি গাল্ফ কো-অপারেশন কাউন্সিলের (জিসিসি) প্রতিনিধিবৃন্দ অভিবাসীদের সর্বোচ্চ সুবিধাদি নিশ্চিত করতে অভিবাসী প্রেরণকারী দেশগুলোকে সবরকম নিয়োগকারী সংস্থা, এজেন্টস ও সাব-এজেন্টগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পরামর্শ দিয়েছে। গাল্ফ কো-অপারেশন কাউন্সিল (জিসিসি) অভিবাসী প্রেরণকারী দেশসমূহের পক্ষ থেকে অভিবাসী গ্রহণকারী দেশসমূহকে চুক্তিপত্র পাঠাতে পরামর্শ দিয়েছে যেন অভিবাসীরা বিদেশে পৌঁছে নতুন কোনো চুক্তির সম্মুখীন না হন এবং এভাবে অভিবাসীদের চুক্তিতে কোনো ব্যত্যয় না ঘটে। জিসিসি-র এই মিটিংটি ১০ দফা ঢাকা ঘোষণার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। এসব দফাতে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীদের পুনর্বাসনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপসহ অভিবাসীদের পুনর্বাসনে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে স্থানান্তরিতদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার তাগিদ দেয়া হয়। এছাড়া ঢাকায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হিউম্যান রাইটস এন্ড বিজনেসের (মানবাধিকার ও ব্যবসা) তৃতীয় সম্মেলনে রেসপনসিবল রিটার্ন (প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে দায়ভার) নিয়েও আলোচনা করা

হয়। এই সম্মেলনে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কর্তা ব্যক্তিগণ এবং ব্যবসায়ী দলসমূহ রেসপনসিবল রিক্রুটমেন্ট (চাকুরি প্রদান সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব) ও রেসপনসিবল রিটার্নের (প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব) বিষয়কে গুরুত্ব প্রদান করেন। বাংলাদেশকে বহির্বিশ্বে ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে এ ব্যাপারে জনমত তৈরির মাধ্যমে বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় ব্যবহার করতে হবে।

সংযুক্তি

সারণি ১

জেলাভেদে লিবিয়া ফেরত অভিবাসীদের বণ্টন

	জেলা	সাক্ষাৎদাতার সংখ্যা	%	বিএমইটি ডাটা	%
১	বাগেরহাট	৪২	০.৪৩	১৩৪	০.৪৫
২	বান্দরবান	১	০.০১	৮	০.০৩
৩	বরগুনা	২০	০.২১	৯১	০.৩১
৪	বরিশাল	৮৬	০.৮৯	৩২০	১.০৮
৫	ভোলা	৪১	০.৪২	১৩৭	০.৪৬
৬	বগুড়া	২০৯	২.১৭	৫৯৪	২.০১
৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৩২৬	৩.৩৮	৯২৭	৩.১৩
৮	চাঁদপুর	২৪৫	২.৫৪	৭২১	২.৪৩
৯	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২৫০	২.৫৯	১,১৩৩	৩.৮৩
১০	চট্টগ্রাম	৬৯	০.৭১	১৬৫	০.৫৬
১১	চুয়াডাঙ্গা	৩৮	০.৩৯	১৮৪	০.৬২
১২	কুমিল্লা	৬৮৮	৭.১৪	১,২৯৭	৪.৩৮
১৩	কক্সবাজার	৫২	০.৫৪	৯০	০.৩০
১৪	ঢাকা	৩৬৯	৩.৮৩	৯১০	৩.০৭
১৫	দিনাজপুর	৩৯	০.৪০	১৫৫	০.৫২
১৬	ফরিদপুর	২৭৮	২.৮৮	৭০৭	২.৩৯
১৭	ফেনী	৭৫	০.৭৭	২৩৭	০.৮০
১৮	গাইবান্ধা	১০৪	১.০৮	২৩২	০.৭৮
১৯	গাজীপুর	১৭৬	১.৮২	৬৮১	২.৩০
২০	গোপালগঞ্জ	৯৬	০.৯৯	৩২৪	১.০৯
২১	হবিগঞ্জ	১৫৭	১.৬৩	৪৮৫	১.৬৪
২২	জামালপুর	২৫৯	২.৬৯	৪৯২	১.৬৬
২৩	যশোর	১৫৯	১.৬৫	৫৯৫	২.০১
২৪	ঝালকাঠি	২৩	০.২৫	৮৬	০.২৯
২৫	ঝিনাইদাহ	১২২	১.২৩	৩৬৭	১.২৪
২৬	জয়পুরহাট	২৪	০.২৫	১০৮	০.৩৬
২৭	খুলনা	৪১	০.৪২	১৩৪	০.৪৫
২৮	কিশোরগঞ্জ	২৫৫	২.৬৪	৯৫৭	৩.২৩
২৯	কুড়িগ্রাম	৩১	০.৩২	৮৩	০.২৮
৩০	কুষ্টিয়া	১৩০	১.৩৫	৪৭৮	১.৬১
৩১	লালমনিরহাট	৩৬	০.৩৭	১১০	০.৩৭
৩২	লক্ষ্মীপুর	১১৭	১.২১	৪৭০	১.৫৯
৩৩	মাদারিপুর	২৫৩	২.৬৩	৮১০	২.৭৪
৩৪	মাগুরা	৮৫	০.৮৮	২৫৩	০.৮৫
৩৫	মেহেরপুর	১০৫	১.০৯	২৭৮	০.৯৪
৩৬	মানিকগঞ্জ	১৮২	১.৮৯	৫৫০	১.৮৬
৩৭	মৌলভীবাজার	১৬	০.১৭	৬০	০.২০
৩৮	মুন্সিগঞ্জ	৪০০	৪.১৫	৯১১	৩.০৮
৩৯	ময়মনসিংহ	২৩১	২.৩৯	৮৭৫	২.৯৫
৪০	নওগাঁও	৮১	০.৮৪	২৯৮	১.০১
৪১	নড়াইল	৩৮	০.৩৯	১২৭	০.৪৩
৪২	নারায়ণগঞ্জ	১১৫	১.১৯	৪৫১	১.৫২
৪৩	নরসিংদী	১৬৪	১.৭০	৮৮৩	২.৯৮
৪৪	নাটোর	৮৬	০.৮৯	২০১	০.৬৮
৪৫	নেত্রকোনা	৪৬	০.৪৮	১৫৫	০.৫২
৪৬	নীলফামারী	৩১	০.৩২	৬৯	০.২৩

(চলমান পাতা)

	জেলা	সাক্ষাৎদাতার সংখ্যা	%	বিএমইটি ডাটা	%
৪৭	নোয়াখালী	**৭০৪**	৭.৩১	**১,৫৫০**	৫.২৩
৪৮	পাবনা	**১১৭**	১.২১	৪৩৬	১.৪৭
৪৯	পঞ্চগড়	১২	০.১২	২৬	০.০৯
৫০	পটুয়াখালী	৩৩	০.৩৪	**১২৩**	০.৪২
৫১	পিরোজপুর	৩৪	০.৩৫	**১৪১**	০.৪৮
৫২	রাজবাড়ী	৯৪	০.৯৭	২৩৭	০.৮০
৫৩	রাজশাহী	৬৪	০.৬৬	২৬৬	০.৯০
৫৪	রাঙ্গামাটি	**১**	০.০১	২	০.০১
৫৫	রংপুর	৬৬	০.৬৮	**১৯৭**	০.৬৭
৫৬	সাতক্ষীরা	৭০	০.৭৩	২০১	০.৬৮
৫৭	শরিয়তপুর	**১৮৩**	১.৯০	৮০৬	২.৭২
৫৮	শেরপুর	৩৬	০.৩৭	**১১১**	০.৩৭
৫৯	সিরাজগঞ্জ	**১১০**	১.১৪	৪০১	**১.৩৫**
৬০	সুনামগঞ্জ	৭৬	০.৭৯	৩০৫	**১.০৩**
৬১	সিলেট	৮৬	০.৮৯	৩৪৮	**১.১৮**
৬২	টাঙ্গাইল	**৬৯৫**	৭.২২	**১,৬৭১**	৫.৬৪
৬৩	ঠাকুরগাঁও	২০	০.২১	৭৪	০.২৫
৬৪	খাগড়াছড়ি	**১**	০.০১	**১৩**	০.০৪
	তথ্য পাওয়া যায়নি	৮৩৩	৮.৬৫	৩,৩৭৪	**১১.৩৯**
	মোট	**৯,৬২৬**	**১০০.০০**	**২৯,৬১৫**	**১০০.০০**

উৎস: বিএমইটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ফেরত অভিবাসীদের তালিকা এবং জরুরিভিত্তিতে লিবিয়া ফেরত বাংলাদেশীদের উপর ২০১১ সালে RMMRU-RPC পরিচালিত জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সারণিটি তৈরি করা হয়েছে।

সারণি ২
লিবিয়া ফেরত বাংলাদেশী অভিবাসীদের কাজের ধরন

পেশা	উত্তরদাতার সংখ্যা	%
দক্ষ, আধা ও স্বল্প দক্ষ		
নির্মাণ শ্রমিক	১,০৫০	১৫.৩০
কার্পেন্টার	১,২৫৩	১৮.২৭
মেসন	১,৬৬৮	২৪.৩২
ইলেকট্রিক মিস্ত্রী	৪৭৭	৬.৯৫
সিরামিক টাইল ফিটার	২৫৮	৩.৭৬
স্টিল ফিক্সার	৯৫৫	১৩.৯২
কাঠমিস্ত্রী	১৪০	২.০৪
পেইন্টার	৪৯	০.৭১
নিরাপত্তা কর্মী	৬৫	০.৯৫
বাবুর্চি	১৭৬	২.৫৬
পরিচ্ছন্নতা কর্মী	১১৯	১.৭৩
কৃষি শ্রমিক ও মালি	৬	০.০৮
গাড়ী চালক	১২	০.১৭
অফিস সহায়ক/পিয়ন	৬	০.০৮
পেশাজীবী		
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২১	০.৩০
মেকানিক/টেকনিশিয়ান	২২	০.৩২
ইন্জিনিয়ার	১৮	০.২৬
নার্স	১৮	০.২৬
ল্যাব টেকনিশিয়ান	৩	০.০৪
ইন্টারপ্রেটার	৫	০.০৭
কম্পিউটার অপারেটর	২	০.০২
ব্যবসায়ী	২	০.০২
অন্যান্য পেশা	৫২	০.৭৩
তথ্য প্রদান করা হয়নি	৪৮২	৭.০২
মোট	**৬৮৫৯**	**১০০.০০**

উৎস: জরুরি ভিত্তিতে লিবিয়া ফেরত বাংলাদেশী অভিবাসীদের উপর ২০১১ সালে RMMRU-RPC পরিচালিত জরিপ।